বিশ্বশান্তি ও বৌদ্ধ দর্শন : প্রসঙ্গ ও প্রাসঙ্গিকতা

Yangki Dolma Sherpa

Assistant Professor

Department of Philosophy, Rajganj College

P.O-Rajganj, District -Jalpaiguri, West Bengal

Abstract : আজ পৃথিবীব্যাপী যে পুঞ্জীভূত ক্রোধ, দুঃখ সহিংসতা ও জিঘাংসা, তা দেখলে মনে হয় আজ এ মুহূর্তেই বুদ্ধের অহিংস বাণীর প্রয়োজন। বুদ্ধ চেয়েছিলেন মানবসমাজকে সর্ববিধ দুঃখের হাত থেকে উদ্ধার করতে। পৃথিবীতে তিনিই একজন সাধারণ ধর্ম প্রবক্তা, যিনি দেশ ও জাতির গণ্ডি অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বের, সমগ্র জীবজগতের মানুষের দুঃখ, বেদনা, অধিকার, মুক্তি এবং জীবন-যন্ত্রণার কথা ভেবেছিলেন। এই একুশ শতাব্দীর অস্থির সময়ের প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কারণ, বিশ্ব মানবতা আজ ভূলুণ্ঠিত এবং বিশ্বশান্তি আজ বিপর্যস্ত। বিশ্ব মানবসমাজ আজ নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে খণ্ডিত ও ক্ষতবিক্ষত। বিশ্বের কোথাও শান্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। দেশ, সমাজ ও বিশ্বের সব জায়গায় যেন অস্থিরতা ও উন্মাদনা। মানুষ শান্তির জন্য যত বেশি ছোটাছুটি করছে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে আপন মনের লোভ, দ্বেষ, মোহ ও প্রতিহিংসার প্রতিযোগিতায়। তা ছাড়া একে অপরকে ধ্বংস করছে ক্ষমতা গ্রহণের প্রতিযোগিতা ও রাজ্য বিজয়ের আগ্রাসনে। বৌদ্ধ দর্শন আজকের পৃথিবীকে আবারও নতুন করে নতুন পথের হদিশ দিতে পারে।

Keyword : বৌদ্ধ, বিশ্ব, শান্তি, শতাব্দী, পৃথিবী, হদিশ

“হে মহামানব বুদ্ধ,

নতুন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,

কর ত্রান মহাপ্রাণ আনো অমৃত বাণী।

বিকশিত করো প্রেমপ্রদ্ম, চিরমধু

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য

করুণাঘন ধরণীতল করহ কলংক শূন্য

দেশে দেশে আজ রক্ত কলুষ গ্লানি

তব মঙ্গল শঙ্খ আনো, তব দক্ষিন পাণি

তব শুভ সঙ্গীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য

করুণাঘন ধরনীতল করহ' কলঙ্ক শূন্য। "

---------- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথিবীর ইতিহাসে যে সমস্ত মহামানব তাঁদের জীবন - বাণী- দর্শন দিয়ে মানুষের বোধের জগতকে আলোকিত করেছেন, নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তির জন্য উপায় বলে দিয়েছেন মহামতি গৌতম বুদ্ধ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রেম- করুণা- মৈত্রী-ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটাতে বুদ্ধ আজীবন প্রয়াসী হয়েছেন। এই একুশ শতাব্দীর অস্থির সময়ের প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কারণ, বিশ্ব মানবতা আজ ভূলুণ্ঠিত এবং বিশ্বশান্তি আজ বিপর্যস্ত। বিশ্ব মানবসমাজ আজ নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে খণ্ডিত ও ক্ষতবিক্ষত। বিশ্বের কোথাও শান্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। দেশ, সমাজ ও বিশ্বের সব জায়গায় যেন অস্থিরতা ও উন্মাদনা। মানুষ শান্তির জন্য যত বেশি ছোটাছুটি করছে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে আপন মনের লোভ, দ্বেষ, মোহ ও প্রতিহিংসার প্রতিযোগিতায়। তা ছাড়া একে অপরকে ধ্বংস করছে ক্ষমতা গ্রহণের প্রতিযোগিতা ও রাজ্য বিজয়ের আগ্রাসনে। বৌদ্ধ দর্শন আজকের পৃথিবীকে আবারও নতুন করে নতুন পথের হদিশ দিতে পারে।

বর্তমান সময়ে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে 'বৌদ্ধ মানবতাবাদ ও সমাজ সমীক্ষা' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, বিশ্ব মানবতা আজ ভূলুণ্ঠিত এবং বিশ্বশান্তি আজ বিপর্যস্ত। বিশ্ব মানবসমাজ আজ নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে খণ্ডিত ও ক্ষতবিক্ষত। বিশ্বের কোথাও শান্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। দেশ, সমাজ ও বিশ্বের সব জায়গায় যেন অস্থিরতা ও উন্মাদনা। মানুষ শান্তির জন্য যত বেশি ছোটাছুটি করছে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে আপন মনের লোভ, দ্বেষ, মোহ ও প্রতিহিংসার প্রতিযোগিতায়। তা ছাড়া একে অপরকে ধ্বংস করছে ক্ষমতা গ্রহণের প্রতিযোগিতা ও রাজ্য বিজয়ের আগ্রাসনে।

তিনি, গৌতম বুদ্ধ, জন্মেছিলেন আড়াই হাজার বছরেরও আগে এই উপমহাদেশে। যিনি বিশ্বাস করতেন, মানব কল্যাণ, মানব মুক্তি, মানব মৈত্রী আর মানুষে মানুষে ভালোবাসা, সম্প্রীতিই জগতকে শান্তির পরিধিতে আশ্রিত করতে পারে। হিংসাকবলিত এই পৃথিবীতে তাঁর জন্মের ক্ষণ ছিল বৈশাখি পূর্ণিমাতে। তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই বৈশাখি পূর্ণিমাতে শুধু আবির্ভাব নয়, বুদ্ধত্ব লাভ এবং মহাপরিনির্বাণও এই তিথিতেই। নিজের মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর দর্শনে অন্ধ বিশ্বাসের কোনোও স্থান নেই। যুক্তি এবং বিচারই এখানে গ্রহণ বা বর্জনের শেষ কথা। তাঁর সময়ের পৃথিবীতে হিংসা, অবিশ্বাস, প্রেমহীনতা এবং লোভ-লালসা প্রায় মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বাতাবরণে বুদ্ধ অহিংসা, নির্লোভ, ক্ষমা এবং প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন। বুদ্ধর মতে, মৈত্রী হচ্ছে সবপ্রাণীর প্রতি কল্যাণ কামনায় ব্রতী হওয়া। মৈত্রীর সংজ্ঞায় বলেছিলেন, 'মা যেমন তার স্বীয় একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে বিপদ থেকে রক্ষা করে, তদ্রুপ সব প্রাণীর প্রতি অপ্রেমেয় মৈত্রী প্রদর্শন করবে। ' এ মহামৈত্রীই শত্রুকে মিত্র, দূরের

মানুষকে কাছে আনার ধারক ও বাহক। এটাই বিশ্বভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে সৌহার্দ্য ও নৈকট্য গড়ে তোলার চাবিকাঠি। এতে মানুষের সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা বিদূরিত হয়। জাতীয় সংহতি বিধানে ও বৈশ্বিক সম্পর্কোন্নয়নে মহামৈত্রী এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই মানুষের প্রতি গৌতম বুদ্ধের অমর অবদান 'বিশ্বমৈত্রী'। এই বিশ্বমৈত্রী কিন্তু শ্রেণী বা সম্প্রদায়গত নয়। সর্বজনীন মানবধর্ম রূপেই স্বীকৃত।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও বুদ্ধত্ব লাভের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বুকে এমন একটি মানবধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে ধর্মের বাণী সম্পূর্ণ অহিংস ও মানবতাবাদী এবং যা বিশ্বের জীবজগৎ ও বিশ্বের সকল মানবগোষ্ঠীর কল্যাণকে আহ্বান জানায়। তাই বৌদ্ধধর্ম একটি সর্বজনীন অহিংস, সাম্য ও মানবতাবাদী ধর্ম। এ ধর্মের বাণীগুলো শাশ্বত এবং সম্পূর্ণ মানবিক আবেদনে পরিপূর্ণ। সুশীল বিশ্ব মানবসমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। এখানে ধর্মের বাড়াবাড়ি নেই। নেই কোনো ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোত্র তথা সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কোনো রকম বৈষম্য। মূলত মানবতা এবং মানবিক গুণাবলির বহিঃপ্রকাশই এই ধর্মের বিশেষত্ব।

এই বিশ্বে জন্ম নিয়ে বৌদ্ধ করুণাঘন অন্তরে যে দর্শন ও বাণী পরিবেশন করেছেন, তাতে বিশ্বমৈত্রীই ব্যাপকতা লাভ করেছে। বিশ্বের সকল প্রাণীর সার্বিক মঙ্গলের জন্য তাঁর পরিবেশিত দর্শন ও বাণী পৃথিবীতে এক অসাধারণ অধ্যায়ের সূচনা করে। হিংসা-দ্বন্দ্বযুক্ত সমাজের বিপরীতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নির্মাণে মৈত্রীময় চেতনাকে স্থাপন করার কথা বলেছেন বুদ্ধ। বিশ্বমৈত্রীর ভাবনা ছাড়া মানুষের সুখ-শান্তি যে সম্ভাবনারহিত, আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধ তা উচ্চারণ করেছিলেন। চেয়েছিলেন 'তুমি যেমন সুখে থাক, অপরকেও সুখে থাকতে দাও'। বুদ্ধের মৈত্রী ভাবনাই তো হচ্ছে, অপরের সুখ ও হিত কামনা করা। সৃষ্ট জগতকে খন্ড খন্ড করে নানা দেশ, নানা জাতি হিসেবে দেখার নাম যে মানবতা নয়, তা উল্লেখ করে বুদ্ধ বলেছিলেন, সমস্ত বিশ্ব ও প্রাণীলোককে অখন্ড হিসেবে দেখার নামই মানবতা। মানুষ মাত্রই সমান। মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা ও বৈষম্য পরিহার করতে হবে। ধর্মের বা দেবতার নামে প্রাণীবধ বন্ধ করতে হবে। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার চলবে না। মানুষকে তার আপন মর্যাদা দিতে হবে। কোনো প্রাণীকে হিংসা করা যাবে না। সব প্রাণীর প্রতি দয়া ও মৈত্রী পোষণ করতে হবে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানী মানুষের কৌতূহল শুধু আজকের নয়, হাজার হাজার বছর আগেও ছিল। গ্রিক দার্শনিকেরা বুদ্ধ সম্পর্কে খুবই ভাবতেন এবং বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ও সমাজচিন্তা নিয়ে গবেষণা করতে খুবই উৎসাহিত হতেন। তাই মহামতি বুদ্ধের দর্শন, জীবনচেতনা ও নীতিবাদ শুধু ভারতীয় নয়, এমনকি গ্রিক কিংবা পাশ্চাত্য দর্শনকেও গভীরভাবে উদ্‌বুদ্ধ করেছে।

ধর্মীয় জীবন প্রচারের শুরুতেই মানবকল্যাণে মহামতি বুদ্ধের কণ্ঠে মহাপ্রেমের মহাবাণী উৎসারিত হয়েছিল। বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করার পর পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখ ও মঙ্গলের জন্য এমন ধর্ম প্রচার করো, যে ধর্মের আদি, মধ্য এবং অন্তে কল্যাণ; সেই অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করো। ' সুতরাং এ বাণী থেকেই ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে মহামানব বুদ্ধের মহত্ত্ব ও বিশালতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বুদ্ধের দুটি বাণী বিশ্ববাসীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করেছিল। সে দুটি বাণীর মধ্যে একটি হচ্ছে সদিচন্তা ও সদ্‌কর্ম সম্পর্কিত-শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাময় জীবন গঠন করা। আর অন্যটি হলো আত্মনির্ভরশীল হওয়া। তিনি সব সময় তাঁর শিষ্যদের বলতেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা মুক্তির জন্য পরনির্ভরশীল হয়ো না, অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না, নিজেই নিজের প্রদীপ হও, নিজে নিজের শরণ গ্রহণ করো। ' জগতে এর চেয়ে নিজেকে তৈরি করার ইচ্ছা ও কর্ম স্বাধীনতার মহৎ বাণী আর কী থাকতে পারে? বুদ্ধের এ বাণীর মধ্যেই রয়েছে মহামানবতাবাদ ও সুন্দর স্বাবলম্বী সমাজ গঠনের উত্তম শিক্ষা।

বিশ্বে যখন বিপন্ন মানবতা, মনুষ্যত্ব বিকাশের চরম বিপর্যয় অবস্থা, ধর্মের নামে অর্ধমের প্রসার- তখন বুদ্ধের আবির্ভাব। বর্ণে বর্ণে জাতিতে জাতিতে দ্বন্ধ সমাজজীবনকে করেছিল প-। যখন হানাহানি, অহিংসা, অশান্তি, বিবাদ, দ্বন্ধ, বৈষম্য মানুষকে নিপীড়নের শিকারে পরিণত করেছে, অধিকারহারা মানুষের গরিষ্ঠতা কেবলই বেড়ে চলেছে, তখন এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ব্যাকুল মানুষ। কিন্তু কে তাদের উদ্ধার করবে পরিস্থিতি তখন এমনই এক সংশয়ে দোলায়িত।

আড়াই হাজার বছর আগেও বিশ্ব পরিপূর্ণ ছিল হানাহানিতে। দূর্যোগের কালো মেঘ ছিল সর্বত্রই। প্রেম, প্রীতি, উদারতা, করুণা, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি মানবিক গুণগুলো লোপ পেতে বসেছিল। শ্রদ্ধা, ভালবাসা, মায়া, মমতা, আত্মবিশ্বাসেও ছিল ঘাটতি। সততার, আলো ছিল অজ ্র দূরে। একটু ভালবাসার স্পর্শ আর সমাজবদ্ধ শান্তিময় জীবন ছিল দূরন্ত ! গৌতম বুদ্ধ যুক্তির অনুশীলনে বিশ্বমানবের মধ্যে ত্যাগতিতিক্ষা, ক্ষমা, অহিংসা, শান্তি ও কল্যাণের বাণী ছড়িয়েছিলেন। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ঘুঁচাতে সাম্য-মৈত্রীর কথা বলেছেন

বুদ্ধের শিক্ষায় অধ্যাত্ম জীবনের মানুষের মুক্তি যেমন কাম্য, তেমনি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধের কথাও অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। সামাজিক মর্যাদা অথবা শিক্ষামূলক গুরুত্বকে বুদ্ধ কখনো খাটো করে দেখেননি। কারণ, বুদ্ধ জানতেন, প্রকৃত শিক্ষাই মানুষের মনকে বড় করে এবং ভালো-মন্দ বিচার করার শক্তি দেয়। বুদ্ধ আরও জানতেন, জাগতিক ইন্দ্রিয় ভোগের উপাদান অথবা ভোগবাদের অত্যুচ্চ আগ্রাসন মানুষকে কখনো সমাজ জীবনের সুখ কিংবা জীবন-যন্ত্রণার মুক্তি প্রদান করতে পারে না।

আজ পৃথিবীব্যাপী যে পুঞ্জীভূত ক্রোধ, দুঃখ সহিংসতা ও জিঘাংসা, তা দেখলে মনে হয় আজ এ মুহূর্তেই বুদ্ধের অহিংস বাণীর প্রয়োজন। বুদ্ধ চেয়েছিলেন মানবসমাজকে সর্ববিধ দুঃখের হাত থেকে উদ্ধার করতে। পৃথিবীতে তিনিই একজন সাধারণ ধর্ম প্রবক্তা, যিনি দেশ ও জাতির গণ্ডি অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বের, সমগ্র জীবজগতের মানুষের দুঃখ, বেদনা, অধিকার, মুক্তি এবং জীবন-যন্ত্রণার কথা ভেবেছিলেন।

সুতরাং আজকের বিশ্বের রাজনীতিতে অথবা বিশ্বজুড়ে যখন আগ্রাসনের যুদ্ধংদেহী মনোভাব, ঠিক তখনই এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা কিংবা এ উপমহাদেশের ক্ষমতা, সার্বভৌমত্ব, ধর্ম ও রাষ্ট্র পরস্পরকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে আমাদের চিন্তার মুক্তির প্রশ্নটি নিয়ে। আড়াই হাজার বছর আগেও মহামানব বুদ্ধ সেই সামগ্রিক মুক্তিটি চেয়েছিলেন সকলের মুক্তির জন্য। এমনকি মহামতি বুদ্ধ অধ্যাত্ম বা বৈরাগ্যজীবনের মুক্তির পাশাপাশি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বিশ্বজনীন মুক্তি ও নিরাপত্তা চেয়েছিলেন। বস্তুত বুদ্ধের এই মুক্তিদর্শন আধ্যাত্মিক জগৎ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পূর্ণতাসহ জাগতিক সকল প্রকার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে পূর্ণ করে।

বুদ্ধের দৃষ্টিতে ন্যায়তন্ত্র হচ্ছে সকল মানুষের সমান অধিকার। সকল মানুষের পূর্ণ গণতন্ত্র এবং সকল মানুষের কর্মশক্তির প্রতিফলন ও মূল্যায়ন। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম মূল বাণী হচ্ছে অহিংসা এবং শান্তি, মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সহ-অবস্থান করা। তাই বৌদ্ধসমাজ দর্শনে সাম্যবাদ, গণতন্ত্র এবং সকল মানুষের ধর্মীয় অধিকার লাভ প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। এখানে কোনো প্রকার বৈষম্য থাকবে না। শ্রেণীস্বার্থ, বৈষয়িক স্বার্থ, এমনকি পদমর্যাদার স্বার্থও থাকবে না। এগুলো হবে এখানে গৌণ। ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় এবং সকল পেশার মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হবে মুখ্য। এখানে সকল মানুষ তার নিজের অভিব্যক্তি স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারবে। সুতরাং সাম্য, ন্যায্যতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা এবং সদ্ নীতি-আদর্শই হবে এখানে মুখ্য।

মহামতি বুদ্ধের জীবনদর্শন ও শিক্ষামূলক আদর্শে তিনি কখনো অতিমানবীয় কিংবা অতিপ্রাকৃতিক জীবনকে গ্রহণ করেননি। তাঁর উন্নততর জীবনে সংযত আচরণ, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের সুনীতি সামগ্রিক মানবজীবনে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই প্রকৃত জীবনগঠনের মানসে শীলের গুরুত্ব বৌদ্ধধর্মে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন।

> বুদ্ধ ধনবাদী তথা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে যেমন উৎসাহিত করেননি, তেমনি বর্ণ ও বৈষম্যবাদী সমাজকেও কখনো স্বাগত জানাননি। কারণ, বুদ্ধ জানতেন ধনবাদ কিংবা পুঁজিবাদ কখনো মানুষের জীবনে সামগ্রিক সুখ আনতে পারে না। দিতে পারে না মানবজীবনকে পূর্ণ নিরাপত্তা। তাই বুদ্ধ চেয়েছেন মধ্যম পন্থার মাধ্যমে 'সকলের জন্য অধিক সুখ প্রতিষ্ঠা'। বুদ্ধের এ নীতিকে সে সময়কার বিশিষ্ট দার্শনিক চিন্তাবিদগণসহ নীতিবাদী ও সমাজবিজ্ঞানীরা বেশ সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। অতএব চলুন, আমরা আজ বুদ্ধের শিক্ষায় মানবিক মূল্যবোধে উদ্‌বুদ্ধ হই। দেশ ও বিশ্বকল্যাণে নিবেদিত হই। সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু। জগতের সকল জীব সুখী হোক। বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক। সকলে মঙ্গল লাভ করুক।

বুদ্ধের জন্ম ও ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর বুকে এমন একটি সর্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার বাণী ছিল আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ; যা সম্পূর্ণ অহিংস ও মানবতাবাদী। সর্ব জীব ও সর্ব মানুষের সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এ ধর্ম। অতএব, বিশ্বের সব জীবের মুক্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে এ ধর্মে এবং সব মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ও অধিকারের সুযোগও দেওয়া হয়েছে। এ জন্যই মহামানব বুদ্ধের বাণীগুলো চিরন্তন, শাশ্বত এবং মানবিক আবেদনে পরিপূর্ণ।

গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা হলো বিশ্ব মানবতার এবং ইহজাগতিক পারমার্থিক জীবনের। বৌদ্ধমতে, শীল সমাধি প্রজ্ঞাময় জীবনের মধ্য দিয়েই একজন মানুষের সর্বোত্তম জীবন গড়ে ওঠে, যেখানে তিনি হন সত্য, সুন্দর ও নীতিবান এবং মানবজীবনের সর্বোচ্চ দুঃখ মুক্তিমার্গ লাভ করতে সক্ষম হন। তাই শীল সমাধি প্রজ্ঞা সাধনাই বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান ব্রত। অন্যদিকে মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক সাধনার বিষয়টিকে বৌদ্ধ ধর্ম বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। বৌদ্ধমতে, শীলময় জীবন, সমাধি এবং প্রজ্ঞাময় জীবনই মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করে এবং বিশ্ব মানবতাকে আলোকিত করতে পারে। তাই বৌদ্ধশাস্ত্র বলে, যে মানুষ যত বেশি শীলাচারণসম্পন্ন, সমাধিপরায়ণ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন, তিনি তত বেশি জীবনে সুখী, নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানে বসবাস করতে পারেন এবং বিশ্ব মানবতার সেবা দিতে পারেন।

তাই বৌদ্ধ জীবন পদ্ধতিতে এবং বৌদ্ধ মানস গঠনের লক্ষ্যে প্রথমে পঞ্চশীল বা পঞ্চনীতির কথা বলা হয়েছে, যেখানে একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রথম থেকেই এই সৎগুণ চর্চার মাধ্যমে তার জীবনকে আদর্শায়িত করতে পারেন। এ পঞ্চনীতিতে ব্যক্তি শুধু নিজেই যে নীতিপরায়ণ হয় তা নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যকেও নীতিবোধে উদ্‌বুদ্ধ করে। এ জন্যই আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সব পর্যায়ে বৌদ্ধ পঞ্চনীতির শিক্ষা সার্থকভাবে অনুশীলন করা উচিত। বৌদ্ধ পঞ্চনীতিতে বলা হচ্ছে-১. কোনো ধরনের প্রাণীকে বধ কিংবা আঘাত না করা, ২. কোনো ধরনের চৌর্যবৃত্তি না করা, ৩. কোনো ধরনের কামাচার কিংবা অবৈধ ব্যভিচার না করা, ৪. কোনো ধরনের মিথ্যা না বলা এবং সর্বশেষ ৫. কোনো ধরনের নেশা বা মাদকদ্রব্য সেবন না করা। এখন নিজকে প্রশ্ন করুন, এ নীতিগুলো যদি আমি এবং আমরা সবাই পালন করি, তাহলে কখনো কি আমরা অন্যের ক্ষতির কারণ হতে পারি? আমরা কি কখনো জীবনে সহিংসতা, যুদ্ধ কিংবা কোনো ধরনের আঘাত বা সংঘাত করতে পারি? আমরা কি পারি অনৈতিক, অসামাজিক ও অমানবিক কাজ করতে? শীল পালনের গুরুত্বকে তাই বুদ্ধ সবিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। জীবনের সব ক্ষেত্রে এ পাঁচটি নীতি অনুশীলন করলে 'শ্রেষ্ঠ জীবন' গঠন করা যায়-যেখানে কোনো ধরনের পাপাচার ও অকল্যাণ থাকবে না।

আবার সৎ জীবন গঠন ও সৎ জীবন পরিচালনার জন্য বৌদ্ধ ধর্মে আটটি বিশুদ্ধ পথের কথা বলা হয়েছে, যাকে বৌদ্ধ পরিভাষায় বলা হয় 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ'; যেমন-সৎ দৃষ্টি, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ জীবিকা, সৎ সংকল্প, সৎ প্রচেষ্টা, সৎ স্মৃতি এবং সৎ সমাধি। এগুলো ব্যক্তির ব্যবহারিক ও পারিবারিক জীবনে যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেও এর প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। এর প্রতিটি নীতি দিয়েই যদি আমাদের জীবন গঠন করা যায়, তাহলে আমরা কখনো পারি না সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা বিশ্বের কোনো ধরনের ক্ষতি বা সংঘাত সৃষ্টি করতে।

বৌদ্ধ মতে, সামাজিক অস্থিরতা ও অসাম্য কখনো সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা নিয়ে আসতে পারে না। মানুষ সততার সঙ্গে চেষ্টা করলে তা দূর করতে পারে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তৈরি করতে পারে। হিংসার ব্যবহারে প্রতিহিংসা ও সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর অবস্থা তৈরি হয়, যা পরে ধংসাত্মক যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্ম দেয়। তাই বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অহিংসা ও বিশ্ব মানবতার কথা বলেছেন।

বৌদ্ধ মতে, সামাজিক অস্থিরতা ও অসাম্য কখনো সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা নিয়ে আসতে পারে না। মানুষ সততার সঙ্গে চেষ্টা করলে তা দূর করতে পারে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তৈরি করতে পারে। হিংসার ব্যবহারে প্রতিহিংসা ও সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর অবস্থা তৈরি হয়, যা পরে

ধংসাত্মক যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্ম দেয়। তাই বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অহিংসা ও বিশ্ব মানবতার কথা বলেছেন।

বৌদ্ধ মতে 'আত্মশক্তি' জীবনের এক পরম সম্পদ। মানবজীবনে এ শক্তি উদ্বোধনের জন্য প্রত্যেক মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানে ভূষিত করেছে। মানুষ হিসাবে আমি যেমন শ্রেষ্ঠ, আত্মশক্তিতেও আমি শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আমি যদি উত্তম হই, সর্বশ্রেষ্ঠ হই, তাহলে আমার প্রতিটি কর্ম ও চিন্তাও হবে উত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ উত্তম মানুষ কখনো অধম কাজ করতে পারে না। শাস্ত্র বলছে, 'হীনধম্ম ন সেবেয়্য, পমাদেন ন সংবসে, মিচ্ছাদিটইঠং ন সেবেয্য ন সিয়া লোকবন্ধনো। ' অর্থাৎ কখনো হীন আচরণ করো না, প্রমত্ত হয়োনা। এ জন্য ধর্মপদে বলা হয়েছে 'কায়িক সংযম সাধুকর, বাচনিক সংযম সাধুকর, আর মানসিক সংযম সাধুকর; যিনি ত্রিবিধ দ্বারে সংযত তিনিই সর্বোত্তম সাধুকর। ' কী অসাধারণ বাণী বৌদ্ধ ধর্মের! এগুলো নিয়ে চিন্তা করলে সমাজের প্রত্যেক মানুষ হবে সৎ, সুন্দর ও নীতিবান। নীতিবান জীবনই একজন ব্যক্তির আদর্শ জীবন ও মহৎ জীবন। তাই বুদ্ধ বলেছেন, মন সব ধর্মের ঊর্ধ্বে। প্রদুষ্ট মনে কেউ যদি কিছু বলে বা করে তখন দুঃখের উৎপত্তি হয়, আর ভালো মনে কিছু বললে বা করলে সুখ ছায়ার মতো তার অনুগামী হয়।

'ধর্ম' হলো মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্য একটি উপাদানবিশেষ, যেখানে মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও সুখ-শান্তি বিদ্যমান। ধর্ম মানুষের নীতিবোধ ও আদর্শকে গড়ে তোলে। এ জন্যই ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তির, পরিবার ও সমাজের সম্পর্ক গভীর ও অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং যেসব কর্মে ন্যায়-নীতি বা সদাচার থাকবে, তাকে বলা হয় সধর্ম। আর যেসব কর্মে এ গুণাবলির অভাব সেটি হলো 'অধর্ম'।

অতএব, মানুষ যদি জীবনাচরণে, কর্মে ও চিন্তায় এবং জ্ঞান ও মননশীলতায় বড় না হয়, তাহলে সে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না। এ জন্যই বৌদ্ধ ধর্মে শীলাচার জীবন এবং নৈতিকতার কথা বারবার বলা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম শুধু আধ্যাত্ম সাধনার জন্য মুক্তি বা নির্বাণ লাভের কথা বলেনি, বরং এতে জীবনের সব ক্ষেত্রে মন্দ বা অসৎ প্রবণতা থেকে মুক্তি এবং জীবনের সব কার্যকলাপে সৎ, নির্লোভ, নির্মোহ এবং বিত্ত-বৈভবে অনাসক্ত ও তৃষ্ণাবিমুক্ত নির্বাণ লাভের কথা বলা হয়েছে।

মহামতি গৌতম বুদ্ধ শুধু জীবনের অনিত্যতা, জীবনের দুঃখ-দুর্দশা এবং পারমার্থিক জীবনদর্শন নিয়ে ভাবেননি, তিনি ভেবেছিলেন ব্যক্তিগত, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনদর্শন নিয়ে, যা আমাদের প্রত্যেক মানুষের জন্য আজ অত্যন্ত অপরিহার্য। এমনকি ইহজাগতিক মানবতার সামগ্রিক কল্যাণের জন্যও। এ জন্যই বুদ্ধ তার নবধর্ম প্রচারের প্রথম বাণীতেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন-'হে ভিক্ষুগণ! তোমরা বহুজনের হিত ও বহুজনের সুখের জন্য এবং সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ো। '

তাই তো আমরা দেখি গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ মানবিক, মনুষ্যবোধের এবং কুশলকর্মে উৎসাহব্যঞ্জক। এ শিক্ষা আলোকিত হৃদয় বৃত্তির শিক্ষা এবং শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা সম্প্রযুক্ত বৌদ্ধ মানবতার শিক্ষা। এ শিক্ষাতে কারও কোনো একক অধিকার নেই, নেই কোনো প্রকার বৈষম্য; আছে সবার সমঅধিকার। এ জন্যই বুদ্ধ বলেছেন, 'ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,/যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচি-সো চ ব্রাহ্মণো। ' অর্থাৎ জন্ম বা জাতির দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ হয় না, কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ হয়। আচার-অনুষ্ঠান ও শীল পালনের দ্বারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়।

বুদ্ধ মঙ্গলসূত্রে ৩৮ প্রকার মঙ্গলবিষয়ক শিক্ষার কথা বলেছেন, যা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। যেমন-বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া, সত্য ও সুভাষিত বাক্য ভাষণ করা এবং সৎ লোকের সংশ্রব এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন গঠন করা। বুদ্ধের মতে, এ শিক্ষাগুলো সবাই ধারণ ও গ্রহণ করতে পারে এবং এগুলো সর্বজনীন শিক্ষার অধিকার। তাই ধর্মপদে ব্যক্ত হয়েছে-'সব্ব পাপস্স অকারণং, কুসলস্স উপসম্পদা/সচিত্ত পরিযোদপনং, এতং বুদ্ধানুসাসনং॥'

অর্থাৎ সব রকম পাপ থেকে বিরত থাকা, সদা কুশলকর্ম সম্পাদন করা, স্বীয় চিত্তকে পরিশুদ্ধ করা-এটিই বুদ্ধের অনুশাসন। চলুন আমরা এই শিক্ষানীতি ও দর্শনকে অনুধাবন করি। মহান বুদ্ধ পূর্ণিমা সর্বজীবের কল্যাণ বয়ে আনুক। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, বন্ধ হোক সব রকম যুদ্ধ ও সহিংসতা। বুদ্ধের এ নীতিকে সে সময়কার বিশিষ্ট দার্শনিক চিন্তাবিদগণসহ নীতিবাদী ও সমাজবিজ্ঞানীরা বেশ সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। আজ একুশ শতকে এসে সারা পৃথিবীজুড়ে যখন চলছে হিংসা, যুদ্ধের উত্তেজনা তখন মনে হয়,, এই অস্থির অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য আবারোও মানুষকে আশ্রয় নিতে হবে, বুদ্ধের শিক্ষায় এবং বৌদ্ধ দর্শনে। আজ আমরা আকাশে - বাতাসে বারুদের গন্ধ চাইনা,,বরং চাই আকাশে উড়ুক বুদ্ধের করুণ চোখের মতো সাদা পায়রা। শান্তিতে ভরে উঠুক এই ধরণীতল, শান্তি আসুক পৃথিবীজুড়ে----।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:-

1. **Lama Dalai : " The Art of Happiness- in a Troubled World", Hodder & Stoughton Publisher, United Kingdom, 1st Edition -July -2009, ISBN-9780340794402**

2. **B. Varma Chadra: " compendium of Buddhist Literature",BR Publishing, Mumbai, 1st Edition-2011, ISBN- 9789380852058**

3) মুখোপাধ্যায় জীবন : "মহান ঋষি গৌতম বুদ্ধ ", দীপ্ত প্রকাশন, কলেজ রোড, কোলকাতা-৭০০০০১, প্রথম প্রকাশ - বইমেলা -১৯৯২।

4)বসু ভাস্কর - " বৌদ্ধ দর্শন", একুশ শতক, প্রফুল্ল চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জুলাই -১৯৯৮

5) ভট্টাচার্য সমরেন্দ্র- "ভারতীয় দর্শন", বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ -২০০৭

6) বসু সুজিত : " বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম", দে'জ পাবলিশিং,১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ -এপ্রিল-১৯৮৪

7) ভট্টাচার্য সুনীল : " বৌদ্ধ জাতক সংগ্রহ",জয়দুর্গা লাইব্রেরি, ৮এ ৫বি কলেজ রোড, কোলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ -নভেম্বর-২০১৫

8) সেন ড. দেবব্রত : " ভারতীয় দর্শন", ব্যানার্জী পাবলিশার্স,,৫/১ এ কলেজ রোড। কোলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ – ১৯৮৭

9) চাকমা নীরুকুমার : " বৌদ্ধ : ধর্ম ও দর্শন", অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৩/সি শাজাহান রোড, মহম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭,বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ -জুলাই-২০১১

সহায়ক পত্র- পত্রিকা

1) Chattyapadhay Madhumita (Chief Editor) : "Jadavpur Journal of Philosophy", Department of Philosophy, University of Jadavpur, Kolkata, Vol-25, Number -1, Year-2015-2016, ISSN-0975-6833

2) Chattyapadhay Madhumita (Chief Editor) : "Jadavpur Journal of Philosophy", Department of Philosophy, University of Jadavpur, Kolkata, Vol-26, Number -1, Year-2016-2017, ISSN-0975-6833

3) সেনগুপ্ত সুমন(সম্পাদক) : " বইয়ের দেশ", আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, মার্চ-২০১৭ সংখ্যা